জাদুকর

শঙ্করলাল ভট্টাচার্যের গল্প

আমি জানতাম আপনি আসবেন। তবে এরকম ঝোড়ো কাকের মতন একটা উদভ্রান্ত চেহারা নিয়ে আবির্ভূত হবেন ভাবিনি। সেদিন দুপুর বেলায় আপনার যে চোখ দুটো দেখেছিলাম সে দুটো কোথায়? মানছি আপনি লজ্জা পেয়েছেন; আপনি ভাবছেন এই মুহূর্তে আমি আপনার বিষয়ে কী ভাবছি, তাই না?

না, আমি কিছুই ভাবছি না। কোনো জাদুকর তার কোনো মুগ্ধ, বিশ্বাসী দর্শককে নিয়ে কখনো আবোল-তাবোল, বিটকেল ভাবনা ভাবে না। সেদিন দুপুরে আমি যখন যৎপরোনাস্তি ব্যতিব্যস্ত ছিলাম লোকগুলোকে বোঝাতে যে সিসের ওই এক টাকার মুদ্রাটা আমি সত্যি সত্যি হাওয়া থেকে বানালাম তখন একমাত্র আপনার চোখেই সেই পূর্ণ বিশ্বাসের চাহনি দেখেছিলাম। রাস্তার পাশে একটা জবরজং আলখাল্লা পরে এতখানি সম্মোহন কেউ সৃষ্টি করতে পারে না। আমি জানি, আপনি বলবেন স্টেজে দাঁড়িয়েও কোনো জাদুকর সত্যিকারের

একটা মুদ্রা সৃষ্টি করতে পারে না। অথচ তা সত্ত্বেও আপনি আমার ঠিকানা খুঁজে বাড়ি অব্দি পৌঁছে গেলেন। কারণ আপনি নিজের দুই চোখকে এখনও অবিশ্বাস করতে পারছেন না। আপনার পাঞ্জাবির ছেড়া পকেটে সেদিন কোনো মতেই একটা টাকার মুদ্রার ঝুলে থাকার কারণ ছিল না। উপরন্তু আপনি সারাক্ষণ সেদিন আপনার দুটো ফুটো পকেটে হাত গলিয়ে সজাগ হায়েনার মতন আমার খেলা দেখছিলেন। আপনি এও দেখছিলেন যে, আমি একবারের মতনও আপনার শরীরের পাঁচ ফুটের মধ্যে আসিনি।

আমি কিন্তু আপনার চোখ দেখেই ঠাওরে নিয়েছিলাম যে, আপনার পকেট খালি, এবং ওই পকেটে দুটো মস্ত ফুটো। আমার উস্তাদ বন্দে মিঞা বলতেন টাকা বার করতে হলে ফুটো পকেট থেকেই বার করা ভালো। প্রথমত, ফুটো পকেট থেকে টাকা বার করলে দর্শক মুগ্ধ হয় বেশি। দ্বিতীয়ত, ফুটো পকেটের তলা থেকে আঙুল গলিয়ে তাতে মুদ্রা ঢুকিয়ে দেওয়ার বাড়তি সুবিধে থাকে। উস্তাদ এও বলেছিলেন যে, ফুটো পকেটঅলা দর্শকের চোখে একটা লজ্জা লজ্জা ভাব থাকে। আবার ভয়ও থাকে, কারণ সবার মাঝখানে জাদুকর তার পকেট হাতড়ালে বেচারার সে কী দুর্দশা ভাবুন!

দর্শকদের মধ্যে ফুটো পকেটঅলাদের বার করতে আমার উস্তাদের বিশেষ একটা সময় লাগত না। কিন্তু উস্তাদের খেলা ছিল ওই অব্দি। উস্তাদ কোনোদিনই সত্যিকারের একটা মুদ্রা সৃষ্টি করতে পারেননি। একবার এক আরবি ফকিরের কাছে উস্তাদ বহুদিন তালিম নিলেন টাকা তৈরির। অনেক কাঠখড় পোড়ালেন, রাত জেগে বহু মন্তর-টন্তর আওড়ালেন। কিন্তু একটা তামার পয়সাও কোনোদিনও ওঁরা পয়দা করতে পারেননি। শেষে একদিন আমায় কাছে ডেকে ফিসফিস করে কবুল করলেন, কোনো জাদুকরই কোনোদিন হাওয়া থেকে টাকা বানাতে পারবে না। খোদার মানা আছে।

সেই যে মনে দাগা খেলাম সেদিন থেকেই প্রায় ঠিকই করেছিলাম এই সব ভোজবাজিদের তালাক দেব। আমার উস্তাদও যদি টাকা বানাতে না পারেন তাহলে জগতে কারোরই আর সে সম্ভাবনা নেই। আর যে বিদ্যায় শুধু অন্যকেই ধোঁকা দেওয়া যায় সে-বিদ্যায়ও কোনো খাস প্রয়োজন নেই আমার। আমি ন-বছর বয়সে মাদ্রাসায় পড়তে যাওয়ার পথে প্রথম যে জাদুকরকে দেখেছিলাম পাঁচমুন্ডি বাজারের পাশে সে কিন্তু সমানে রটাচ্ছিল এই খেলাতে পায়রা, মুরগি আর তামাক বানানো যায়। একেকটা খেলা শেখাতে ও দাম নিচ্ছিল ছ-টাকা করে। আমার কোঁচড়ে সেদিন একটা আধুলিও ছিল না। কাজেই শিখতে পারিনি। তবে সেদিন দুপুরেই শপথ নিয়েছিলাম আমি সব খেলার গোড়ার খেলা টাকা বানানো শিখব। অযথা মুরগি, পায়রা বানানো বেশ ঝামেলার ব্যাপার। টাকা বানানো আরেকটু বেশি কঠিন হলেও বেশ পরিচ্ছন্ন। আর তা ছাড়া, আমি ওই ন-বছর বয়সেই দেখেছিলাম যে, ললাকে চোখের সামনে গোটা গোটা টাকা দেখলে কীরকম বুদ্ধু মেরে যায়। আমাদের গ্রামে এখনও লোকের ধারণা আছে যে, টাকা কখনো বানানো যায় না। উঁBকশালে যা টাকা তৈরি হয় সেই টাকাই আমাদের হয় চাকরি করে নয়তো বাণিজ্য করে আয় করে নিতে হবে। জাল-জোচ্চুরি কিছু হয়, কিন্তু সময় মতন সেসব ধরাও পড়ে যায়। একেবারে খাঁটি টাকা তৈরি সাধারণ মানুষের কম্ম নয়। আর এইসব জেনেশুনেই রোখের বশে এই শ্রীমান এই লাইনে এলেন।

না, আপনি মুখ ঘুরিয়ে বাইরের দিকে হন্টন লাগাবেন না। টাকা যে জাদু দিয়ে তৈরি করা যায় না এই মহৎ তত্ব শোনাবার জন্য আমি আপনাকে দাঁড় করিয়ে রাখব না। আপনি চাইলে আমার ঘরের মেঝেতে বসতেও পারেন। শুধু রাংতাগুলোর ওপর বসবেন না। ওগুলো আমার পোশাক তৈরির কাজে লাগে। যখন এসেই পড়েছেন তাহলে বলেই ফেলি—আমি বাস্তবিকই টাকা তৈরি করতে পারি! যখন খুশি চাইলেই পারি, অতখানি বলব না। একেক

সময় কেমন কেমন করেই জানি হয়ে যায়। খুব বেশি টাকাও নয়, এই ধরুন একটা টাকা, কি দুটো। তাও কাগজের নোট নয়, ওই ধাতুতেই। আমি ওইসব টাকা কখনো জমাই না! পাছে কোত্থেকে কী বেরিয়ে পড়ে। আমি এই টাকা দিয়ে চুল্লু কিনে খাই। যাতে হাওয়ার টাকা জলেই যায়। ইচ্ছে হয় ফকিরদের দিই, কিন্তু দেশে আজকাল খাঁটি ফকির কোথায়? সব তো দু-নম্বর। যাকে দেবেন সে শালাও গিয়ে চুল্লু টানবে।

তবে মজাটা কী জানেন? আমাকে টাকা তৈরির বাজিটা শিখতেই হল না। মৌলালির দরগার পির নবী হালিম সাহেবকে চেনেন? বেজায় জ্ঞানী লোক। একদিন কথায় কথায় আমায় বলেছিলেন যে, যে বাজিকর নিজের বিদ্যে দিয়ে নিজেকেই তুক করতে পারে সে-ই আসল বাজিকর। কোনো বাজিকরই নিজের ওপর জল ফেলতে পারে না। আর তা না পারলে কেউ কি টাকা বানাতে পারবে? এই হল গিয়ে হক কথা। এক-শো কথার একখানা। আমি সেদিন ওঁর কথা শুনে এসে আমার সমস্ত যন্ত্রপাতি চুলোয় গুঁজে দিলাম। যাক শালা সব পুড়ে ছাই হয়ে। তারপর বেরিয়ে পড়লাম দু-চার টাকা নিয়ে চুল্লু পান করতে। কিন্তু, মাইরি বলছি, সেদিন যেন কিছুতেই নেশা হতে চায় না! অতগুলো গেলাস শেষ করেও যেন মনে হল বিলকুল জমেনি। আমার একটু আফশোসও হল! ভাবলাম যন্ত্রগুলো না পুড়িয়ে বেচে দিলেও কিছু টাকা আসত। অন্তত আজকের নেশাটা এরকম আধখামচা হয়ে থাকত না।

কিন্তু বাড়ি ঢুকেই মাথাটা ঘাড় থেকে নেমে আসার জোগাড় হল। দেখি চুলো যেমনকার জ্বলে যাচ্ছে দাউ দাউ করে, কিন্তু যন্ত্রগুলো যেমনকার তেমনই আছে। এতটুকু পোড়ার নাম নেই। প্রথমে ভাবলাম আমার নেশাটা বোধ হয় একটু বেশিই চড়েছে, তাই যা খুশি দেখতে শুরু করেছি। তখন দু-গেলাস জল ঢাললাম গলায়। কিন্তু না! যা দেখেছিলাম তাই দেখে যাচ্ছি। তখন গালে দুটো চড় কষে দিলাম। কিন্তু তাতেও কিছু বদলাল না। অগত্যা জামাকাপড় সমেত

চৌবাচ্চায় ঝাঁপ দিলাম, যদি তাতে অন্তত নেশা কাটে। ছ্যাঁচোড় নেশা কাটাতে চৌবাচ্চায় কান অব্দি ডুবিয়ে বসে থাকলে কাজ হয়। কিন্তু কাটল কই? ফিরে এসে যা দেখার তাই দেখলাম। চুলো জ্বলছে থেকে থেকে পটপট করে কয়লার ফুলকি উড়িয়ে। কিন্তু জাদুর যন্ত্রগুলো তাতে যেন আঁচ পোহাচ্ছে। পুড়ে ছাই হওয়ার ধর্ম তারা ভুলেই গেছে।

আর তখন, ঠিক তখন, আমার একটা অদম্য কৌতূহল হল ব্যাপারটা অরেকটু তলিয়ে দেখব। আমি উনুনে আমার তর্জনিটা আলতোভাবে ঢুকিয়ে দিলাম। প্রচন্ড তাত লাগল আঙুলে, কিন্তু সেটা পুড়ল না। আমি আস্তে আস্তে গোটা হাতটাই ঢুকিয়ে দিলাম, এবং হাতটা যেমনকার তেমনই রইল। যেন আগুন নয়, আগুনের একটা প্রতিবিম্বের সঙ্গে আমি নওছল্লা করছি। আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। ভয়টা এই জন্য নয় যে, এবার থেকে আমার আর আগুন দিয়ে কাজ হবে না, কী রান্নার, কী জঞ্জাল পোড়ানোর; কিন্তু যে-কোনোদিন হয়তো আমি ইচ্ছে করলে টাকা বানাতে পারব। যাকে আগুনে পোড়ায় না সে শুধু ইচ্ছামৃত্যুই পায় না, তার জাদু তার নিজের ওপরও বর্তায়।

বিশ্বাস করুন, সেই দিন থেকে আমি একটি রাতও ঘুমোইনি। কারণ আমার শয়ন, জাগরণ, আহার ও জীবন সবটাই ওই খেলার ওপর নির্ভর করে আছে। আমি নিজেকে জাদু করে নিজের ওপর কোনো কতৃত্বই ফলাতে পারি না। আমার দুঃখ কিংবা আনন্দের অনুভূতির জন্যও কিছুটা ভেলকির প্রয়োজন। আপনি চাইলে আপনার হাতটা উঠে গিয়ে আপনার কান স্পর্শ করবে। আমার হাত ওঠে কিন্তু জাদুবলে। আমার জাদু না-চাইলে আমি পুড়তে, পড়তে, উঠতে, নামতে, বাঁচতে বা মরতেও পারি না। যেদিন থেকে এই জাদু আমার শরীর ও মনে চড়েছে সেদিন থেকে আমি অসংখ্যবার মরতে চেয়েছি। কিন্তু মরার জন্য সমস্ত বন্দোবস্ত করেও (মায় গোর ও নমাজের ব্যবস্থা) শেষ অব্দি

টের পেয়েছি যে আমার মৃত্যুর আসল বাসনার ক্ষমতা বা দায়িত্ব আর আমার মধ্যে নেই। আমারই দ্বিতীয় কোনো সত্তা, কিংবা আমার আসল আমিটাই হয়তো স্থির করে আমার কপালে কী ঘটবে না ঘটবে। আর যেহেতু অগুন্তি বার মরার ইচ্ছে ও চেষ্টা করেও আমি মরে যেতে পারিনি আমি জানি না আমি বেঁচে আছি কার ইচ্ছে, কার দোহাইয়ে।

ইদানীং আমার আর খিদেও পায় না মদের নেশাও চলে গেছে। জাদু দেখিয়ে পয়সা আয় করার কোনো প্রয়োজন আমার আর একেবারেই নেই। মাঝেমধ্যে দুটো-চারটে টাকা তো

আমি নিজেই তৈরি করে নিই। যেমন এই টাকাটাই ধরুন না কেন। কী, বোঝা যায়? নিজের কোনো টাকার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পারেন। কী বললেন? আপনার টাকা আর এই টাকাটা হুবহু এক! মানে দুটো টাকার মধ্যে কোনো ভেদই নেই? বলছেন যে ওই দুটো টাকা আসলে একটাই টাকা। অর্থাৎ একটাই টাকা দুই তালুতে দু-বার করে আছে, একই সময়ে, একই মুহূর্তে? কিন্তু ওই দুটো টাকা দিয়ে দুটো আলাদা দোকান থেকে আলাদা আলাদা দ্রব্য আলাদা আলাদাভাবে আলাদা আলাদা সময়ে কেনা যাবে। আপনি টাকা দুটো বাইরে নিয়ে গিয়ে এক্ষুনি পরখ করে নিতে পারেন। আমি বহুবার একই মুদ্রা আলাদা আলাদা সময়ে আলাদা আলাদা দোকানে খরচ করেছি। যার থেকে আমার প্রায় ধারণাই হতে চলেছে যে, আমার জগতে শুধু একটাই টাকা আছে, যেটা অনবরত ঘুরে ঘুরে আমার হাতে আসে এবং সময় মতন খরচ হয়ে চলে যায়। আমার টাকার জগতে শুধু একটাই এক টাকার মুদ্রা আছে, যেটা আমার তৈরি, না কোনো টাঁকশালেরই সৃষ্টি আমি আর সঠিক বলতে পারব না। কিন্তু

ওই একটি টাকা দিয়েই ছয়-ছয়টা বছর আমার সংসার চলছে, দুনিয়ার সব প্রয়োজন মিটছে। যখনই আমি হাওয়া থেকে কোনো টাকা তৈরি করি আমার

মনে হয় আমি সেই টাকাটাকেই নতুন করে ফিরিয়ে এনেছি। বাজারে কিছু কেনাকাটা করলে আমি এক টাকার মুদ্রা ছাড়া ফেরত নিই না। ছয় বছর হল আমি কাগজের টাকার ব্যবহার ভুলে গেছি। এই মুহূর্তে আপনার বাম তালুর মুদ্রাটা হল সেই মুদ্রা যেটি আপনার ফুটো পকেট থেকে বার করে আপনাদের চমকে দিয়েছিলাম। সবাই অবাক হয়েছিল, কিন্তু সবাই জানল ওটা হাতের কারসাজি। ব্যাতিক্রম শুধু আপনি। আপনি আমার টাকাটা হাতে নিয়ে সোল্লাসে চিৎকার করে বললেন, না, না, বাজি নয়, জাদুকর টাকাটা হাওয়া থেকে বানিয়েছে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে আমার চোখে পড়ল আপনার দুই ঘন, কালো, অপার-বিস্মিত চোখ দুটির ওপর। এই প্রথম একজন দর্শক জনসমক্ষে স্বীকার করল যে, আমি সত্যিই টাকা বানাতে পারি। আমি খুশি হয়ে আপনাকে টাকাটা দিয়েই দিলাম। আমার নাম লেখা একটা চিরকুটও আমি আপনার দিকে ছুড়ে দিলাম। যদিও আপনার চোখ দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল যে, আপনি হয়তো আমায় চেনেন। আমার নিবাসও হয়তো আপনার জানা আছে। আর আমার ভেতরে ভেতরে কে যেন বলে উঠল যে আপনি অতি অবশ্য আমার পিছু নেবেন। আপনার পকেট ফুটো, আপনার বিশ্বাসী না হয়ে উপায় নেই। আপনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেছেন যে, টাকা হাওয়ার থেকেও তৈরি হতে পারে।

মাইরি বলছি, আপনাকে আমার নিদারুণ প্রয়োজন ছিল। নিজের বাইরে কেউ জানবে না যে, আমি টাকা বানাতে পারি, এটা হয় না। এরকম ভাবলেই আমার নিজেকে খতম করে ফেলার রোখ চাপে। কিন্তু, আগেই বলেছি, আমি চাইলে আর মরতে পারি না। কিংবা আমি বহুকাল যাবৎ মরেই আছি কি না তাও আর নিশ্চিতভাবে জানতে পারি না। আপনাকে দেখে তাই কিছুটা স্বস্তি হল। যাক, আমার বাইরেও একটা লোক অন্তত আমার জাদুকে চিনেছে। কী! কী বললেন? আপনি আমার বাইরে নাও হতে পারেন! এ কী ছেলেখেলার কথা? জ্বলজ্যান্ত মানুষটি দাঁড়িয়ে আছেন আমার সামনে সেই সকাল থেকে

(বসতে বলা সত্ত্বেও বসলেন না) আমারই বানানো দুটো টাকা দুই তালুতে শুইয়ে রেখে আর আমার মুখের ওপর বলে দিচ্ছেন যে, আপনি লোকটি আসলে আমি? এই তো আমি আপনাকে স্পর্শ করলাম, আপনার ছেড়া পাঞ্জাবির ওপর দিয়ে সস্নেহে হাত বুলিয়ে আপনাকে আদর করলাম। আমার হাত দুটো তো এখন আপনার মসৃণ গ্রীবায়। আমি আদরের বদলে এই গলাটা টিপে আপনাকে হত্যাও করতে পারি। কিন্তু আপনার গলা টিপলে আমার নিজের গলাতেও লাগছে

কেন? আমার নিজের গলা বহুবার টিপে দেখেছি। তাতে আমার লাগেও না, মরিও না। কিন্তু এখন আমার লাগছে। উফ! আমার দম যে বন্ধ হওয়ার উপক্রম হল! এ কী! আমার চোখের সামনে সব এরকম ঝাপসা লাগছে কেন? আমার নিজের সেই কামনার মৃত্যুর জন্য আমাকে কি আপনার গলায় এরকম হিংস্র চাপ সৃষ্টি করতে হবে? আমি কার জন্য মরলাম বা কে আমার জন্য মরল? মরবার অন্তিম মুহূর্তেও কি আমি জানব না এই মৃত্যুটা আসলে কার?